কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং প্রসঙ্গত

অরবিন্দ পুরকাইত

ম্লান হয়ে এল সেই পৃথিবীর ঘ্রাণ,
সময়ের শিথিল শরীর
মৃত্যুর বুদ্বুদে ক্ষত,
মরা গান
বিস্মৃত আকাশ
মাটির স্থবির চোখে আজও।
এ চোখ আবারো হবে কুমারীর চোখের আকাশ,
স্বপ্নের পাখির ঝাঁক
সে-আকশে উড়ে যাবে সহস্র পাখায়
পৃথিবীর সেই জন্মদিনে
রেখে যাই আমার বিস্ময়;
আমার চোখের আলো,
মনের খানিক পরিচয়।

এমন সাহিত্যসর্বস্ব মানুষ আর ক'জন ছিলেন বাঙলা সাহিত্যে! আলাউদ্দীন খাঁ, শচীন দেববর্মন, হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য, অম্লান দত্তদের মতো কৃতী সন্তানের ধাত্রী কুমিল্লা শহরের ঈশ্বর পাঠশালার কোনও শ্রেণিতে দ্বিতীয়-না-হওয়া ছাত্রটি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির পাঁচ বছর অর্থাৎ তাঁর বারো থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত সম্পাদনা করেন হাতে - লেখা 'আরতি' পত্রিকা, যা শুরুর ঠিক অব্যবহিত পুর্বেই জ্বালিয়ে নিয়েছেন কবিতার আলো—কুমিল্লায় মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পরে তাঁদের স্কুল প্রাঙ্গণে হওয়া প্রতিবাদ-সভায় সেদিনই লেখা গানে সুর বসিয়ে নজরুলের গাওয়ার নাটকীয় দৃশ্য দেখে, সেই 'সভাদৃশ্যের নায়ক পথিক - গীতিকারের আগুন থেকে।' ওই শহরেরই ভিক্টোরিয়া কলেজে আই.এস.সি. ও বি.এ.-র চার বছর সম্পাদনা করেন কলেজ ম্যাগাজিন। ছোটবেলা থেকে নানা বই-পড়তে-ভালোবাসা তিনি কেবল সম্পাদনাই করেছেন, কিছুই লেখেননি—এমনটি হওয়া তো প্রায় অসম্ভব; যদিও সে-সব লেখার কোনও হদিশ মেলে না। তাঁর নিজের বয়ানেই কেবল জেনেছি আমরা যে নিতান্ত বালক বয়সেই 'খোকাখুকু" কাগজে 'কাজীর বিচার' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয় এবং সেজন্য পুরস্কৃতও হন তিনি।

ছেলেবেলায় যাত্রা, কবিগান নিয়ে মেতে ছিলেন সঞ্জয়। যৌবনে এক সময় নানা কারণে নাট্যরচনা ও অভিনয়ের সংশ্রবে নিজেদেরকে ধরে রাখা যখন আর সম্ভব হল না, সুদুর মফস্বল শহরে বসে কলকাতার মানের সাহিত্যপত্র প্রকাশের স্বপ্ন দেখলেন নাট্যামোদী কয়েকজন 'এরিস্টোক্রেট ভ্যাগাবন্ডস'। কল্লোল - কালিকলম-প্রগতির পথ ধরে, ১৯৩১-এ (শ্রাবণ ১৩৩৮) প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রের পরে উল্লেখযোগ্য এক পত্রিকা 'পূর্বাশা' নিয়ে হাজির হলেন (এপ্রিল ১৯৩২) তেইশ বছরের যুবক সঞ্জয় (পত্রিকার নামও তাঁরই দেওযা)। তার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির কথা ভেবে, দু-একজন শুভানুধ্যায়ীর আশ্বাসে ভর করে পরের বছরই তাকে নিয়ে পাড়ি দিলেন মহানগরীর অজানা আস্তানার উদ্দেশে। প্রকাশে মাঝে-মধ্যের অনিবার্য ছেদ পড়া বাদ দিলে এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে বছর তিনেকের জন্য (১৯৪০-৪৩) 'নিরুক্ত" পত্র সম্পাদনা ব্যতিরেকে সূচনা হল এক আজীবন সম্পর্কের! পূর্বাশাকে অকৃতদার সঞ্জয়ের বউ বলে উল্লেখ করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার। আর সঞ্জয় যদি পূর্বাশার জন্য জীবন উৎসর্গ করে থাকেন, বন্ধু সত্যপ্রসন্ন দত্ত জীবন উৎসর্গ করেন সঞ্জয়ের জন্য। এ দৃষ্টান্ত বিরল সাহিত্যজগতে। লোভনীয় চাকরি ত্যাগ করে পত্রিকার প্রকাশক এবং বন্ধুর একান্ত নির্ভর হয়ে তিনিও রয়ে গেলেন অকৃতদার!

বাঙলা ভাষায় প্রধান প্রধান আধুনিক কবিদের অনেকেই অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (তাঁদের অনেকেই একটানা পড়াশুনায় ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত, আর তাঁর বত্রিশ বছর বয়সে গিয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি'-তে প্রাইভেটে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন সঞ্জয়), মাঝে 'মডেল ফার্মিং অ্যান্ড মেশিনারি"ইত্যাদি উদ্যোগ ছাড়া সঞ্জয় আজীবন সাহিত্যেই সমর্পিতপ্রাণ। নিজের ভালোবাসার নারী অল্প বয়সে মারা যাওয়ার পর, সকল ভালোবাসা তাঁর ধেয়েছিল সেই সাহিত্যেরই পানে!

দুই

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' নামে (১৯৩৭)। তারপর পৃথিবী (১৯৪০), সংকলিতা (১৯৪২), নতুন দিন (১৯৪৭), প্রাচীন প্রাচী (১৯৪৮), যৌবনোত্তর (১৯৪৮), অপ্রেম ও প্রেম (১৯৫২), পদাবলী (১৯৫৩), সবিতা (১৯৫৮), উত্তরপঞ্চাশ (১৯৬৩), উর্বর উর্বশী (১৯৬৫) প্রভৃতি। কবিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন সঞ্জয় : 'গুণী কাব্যরসিকের চোখ আর কান সমান সজাগ থাকে। কাব্য ছ'টি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গী হয়ে তবে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। চিত্রগীতি বেদনায় যে রঙ ফলায় তাই-ই কাব্যের অস্বাদিত রঙ।'[১] প্রসঙ্গত, 'সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ভারবি, আশ্বিন ১৪০৮) পুস্তকে সম্পাদক সুশান্ত বসু জানাচ্ছেন 'গ্রন্থাকারে ছাপা এবং নানা পত্র-পত্রিকায় ছাপা অথচ

গ্রন্থাকরে প্রকাশিত নয় এ-রকম সাঁইত্রিশটি উপন্যাস, তিনটি গল্প-গ্রন্থ, দশটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ, একটি কিশোরপাঠ্য - কাহিনী, তিনটি নাটক এবং পূর্বাশা অবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ইতিহাস, ধর্ম, পূরাণ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক অসংখ্য অগ্রন্থিত প্রবন্ধ'র কথা। কেমন কবিতা লিখতেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য? এখানে আমরা কিছুটা স্বাদ নেব তার।

'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের 'নীলিমাকে' কবিতায় লিখছেন কবি : 'জানি, তুমি আমায় ডাকবে—/ (নীল বন কি কথা কয়ে উঠল— / আর মেঘের গায়ে-গায়েনেমে এল স্বপ্নরা?/ আমার চোখ নরম হয়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,/ তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।' দিগন্তে কালো চুল ছড়িয়ে, হাওয়ায় নিঃশ্বাস ভরে দিয়ে জীবন-কাঠির ছোঁয়ায় যখন রাজকন্যা জেগে উঠবে উঠবে করছে, 'বেজে উঠল হঠাৎ মোটরের তীক্ষ্ণ হর্ন—/ মিথ্যে কথা, রাজকন্যা তো জাগেনি' (নিশীথ-নগরী) আত্মমগ্ন প্রকৃতিরাজ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অনিবার্য দাপাদাপির কাছে অসহায় কবির এই সুর ধ্বনিত হয়েছে এই কবিতা সংকলনের একাধিক কবিতায়। তাঁর স্মৃতির দুপুর, যে দুপুর 'কাঁপে গানের সুরের মতো', যে দুপুরে 'রোদের স্রোতে ঢেউ তুলে/ উড়ে যায় পাখিরা', যে দুপুর নামে পাখির পালকে' কবির আক্ষেপ: 'আজ কি আর পাবে সে দুপুর/ কোথায় সে হারিয়ে গেছে কে জানে?/ উড়ছে আকাশে এরোপ্লেন—/আর জানো?—/ পাখিরা পুড়ে গেছে রোদের আগুনে' (এরোপ্লেন)। 'ইলেকট্রিসিটি' কবিতায় লিখছেন : 'বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—/ পুরোনো চাঁদে সেই পুরোনো জ্যোৎস্না/ আর পুরোনো রজনীগন্ধার গন্ধ : ওরা ফিরে ফিরে আসে ফুলের উপর প্রজাপতির মতো।...ফিরে যাই ঘরে/ জ্বলছে যেখানে নতুন দানব/ ইলেকট্রিসিটি।' প্রসঙ্গত, বারবার জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্যে। এই কাব্যগ্রন্থেই যেমন একটি কবিতাই রয়েছে 'জ্যোৎস্নায়' শিরোনামে (আজ আর ঘুম নাই। আকাশের ঘুম নাই যেন।/ নরম ঘুমের মতো জ্যোৎস্না জেগে রয়।...) যা পরিচয় পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯ -এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটিতে একাধিক বার জ্যোৎস্নার উল্লেখ থাকলেও এবং বিশেষত ঐতিহাসিক নগরী ইত্যাদির উল্লেখে জীবনানন্দকে মনে পড়িয়ে দিলেও—এই জাতীয় কবিতায় এক ধরনের মন- কেমনিয়া অনুভূতি বোধহয় হয়েই যায়। আর এক দুর্বলতা তার নীলিমার প্রতি! এমনকী, জীবনানন্দের 'নীলিমা' থাকতে ('কল্লোল' পত্রে প্রথম পাঠানো এবং প্রকাশিত কবিতা) এই কাব্যগ্রন্থে লিখলেন পূর্বোক্ত 'নীলিমাকে' অবশ্যই নিজস্ব সুরে (রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর/ অন্ধকারের সাগর—/ তুমি তাতে স্নান করে এস, নীলিমা,/ তোমার চোখ হোক আরো নীল, / চুল লোক ধূসর ফুলের মঞ্জরির মতো।...)

'পৃথিবী' কবিতা সংকলেনর প্রধান সুরটি জীবনানন্দের ভাষা 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' যেন। যেমন, 'মুমূর্ষু'-র শে, চার পঙ্‌ক্তি এইরকম: 'আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর অন্তিম দিবস,'/ নামে মৃত্যু পৃথিবীর জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহময়; / আমাদের পঙ্গু আত্মা পায় নিত্য মৃত্যুর পরশ/ মানুষের ইতিহাস বুঝি আর হবো না অক্ষয়।' 'আশ্বিন ১৩৪৬' কবিতায় কবির আর্তনাদ আজও আমরা অনুভব করতে পারি : 'যে আকাশে রঙ নেই,/ ওড়ে শুধু কালো এরোপ্লেন—/ বিষের ধোঁয়ায় যারা ছায়া আজ মৃত্যুর মতন—/ যেখানে হয়েছে মেঘ আগুনের শিখার শরীর—/ আমাদের রক্তে নেই ব্যথা, ভয় সেই পৃথিবীর।/ ...আমরা দেখিনি সেই মারণের মরণের পণ—/ অশ্রুজলে পরিপূর্ণ প্রতি মুহূর্তের ইতিহাস!/ আমাদের রাত্রি আসে সুপ্তি আর স্বপ্নে সুমধুর—/ বিনিদ্র যাদের চোখ তারা বুঝি যাবে বহুদূর।' তেমনই একটি অনবদ্য কবিতা 'ঘাম', যেখানে বরণীয়, বন্দিত মানুষের শ্রমশক্তি—যার মধ্যে নিহিত নতুন পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি। কবি সেখানে বলেছেন: 'আর ফুলের গন্ধ নয়, পৃথিবী,/ ভালো লাগে এবার ঘামের মূল্যেই যে আমাদের তৈরি করতে হয় নতুন পৃথিবী।

'সংকলিতা'য় (আদতে, তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতার বই থেকে এবং আরও অন্যান্য কবিতা নিয়ে এই সংকলন গ্রন্থ) স্থান করে নেওয়া বিবিধ কবিতার মধ্যেও নতুন পৃথিবী, নতুন মানুষের আবাহন শুনতে পাই আমরা : 'দাও আমাদের আকাশকে ইস্পাতে মুড়ে—/ বিদ্যুতে জ্বলুক আমাদের সূর্য,/ কার্বন-ডায়োক্সাইডে ভরে যাক হাওয়া,/ আমরা বেঁচে থাকি ক্লাইভ স্ট্রিটের দালানে/ বেঁচে থাকি কংগ্রেসে আর সিনেমায়।/ তুমি মরে যাও দেবতা—/ ভরে উঠুক আমাদের নতুন পৃথিবী/ তোমার প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসে'। (প্রেতায়িত) কিংবা, 'হে যুগ-দেবতা/ কর অবসান/ মানুষের গড়া রূঢ় সভ্যতা/ সভ্যতা-গড়া/মানুষেরে, / বন্ধ্যা পৃথিবী/ চেয়ে আছে তারে সন্তান দাও/ দাও পৃথিবীর/ মানব মন।'' (মানুষ)

'যৌবনোত্তর' কবিতা সংকলনে স্মৃতিমেদুরতা আর মৃত্যুর মহিমা : 'সময় খচিত ছিল কারুকার্যে হয়েছিল জীবনের আশ্চর্য নির্মাণ; / জীবনের হাত থেকে আজ এরা পৃথিবীর হাতে—/ ভোরের আলোতে আর সন্ধ্যার ছায়াতে!/ হৃদয়ের সকল ক্ষমতা / একে একে প্রকৃতির হাতে দিতে হয়—/ হয়তো এ সময়ের অন্য কোনো কারুকার্য—মৃত্যুর বিস্ময়'। (অনুভব)

এক দার্শনিক বিষণ্ণতা যেন হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে 'অপ্রেম ও প্রেম' কবিতা সংকলনের নাম - কবিতার এই পঙক্তিগুলিতে : 'একদিন সব ভুলে যাই।/ কিছুই থাকে না আর তোমার আমার/ কোনো কথা, কোনো মন, সময়, আকাশ,/ শিহরিত সিঁড়ি দিয়ে হৃদয়ের পাতালে নামার/ কোনো চিহ্ন, ইতিহাস—— কিছুই না।

কোথাও কোথাও জীবনানন্দের কণ্ঠ প্রতীয়মান হয়: 'তাদের অনেক ঘাম/ অনেক চোখের জল/ বহু রক্ত/ শুকায়েছে পৃথিবীর রোদ—/ তোমাদের ইতিহাসে—/ কোনো স্মৃতি আসে নাই তার,...' (উহ্য, সংকলিতা). 'অনেক বছর পরে যদি দেখা হত/ যখন আরেক মেয়ে তুমি,/ তোমার চোখের থেকে যত কালো আলো ঝরে গেছে/ আবার নিবিড় হত তারা, '/ অনেক দূরের রাত দুরের ঢেউয়ের মতো এসে মিশে যেত এই চুলে—' (অবিচ্ছিন্ন, অপ্রেম ও প্রেম), পৃথিবীর রূঢ় আলো মুছে দেয় সব পরিচয়, / সব ছায়া মুছে ফেলে রৌদ্রে এসে দাঁড়ায় হৃদয়/...সেই পৃথিবীতে বুঝি নেই আর আমাদের হৃদয়ের নীড়,...' (পুরোনো পরিচয়, অপ্রেম ও প্রেম) বা 'আকাশ তখনো থাকে—/হারায় না পৃথিবীর পর্যাপ্ত পরিধি:/ তখন আবার যারা তুমি - আমি—সময়ের সফল সন্তান—/ হয়তো পেয়েছি তারা সমুদ্রের, বিদ্যুতের মতো এক জীবনের ঘ্রাণ।' (প্রতিশ্রুতি, পদাবলী) জীবনানন্দীয় সেই

বিখ্যাত 'ড্যাস"ও (—) সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রভূত বর্তমান।

এ প্রসঙ্গে, দু-একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন : 'নিজস্ব কাব্যজগতে জীবনানন্দের মনোজগতের কিছু অংশ সঞ্জয় ভট্টাচার্য গ্রহণ করেছিলেন— অবশ্যই কিছু সীমায়িত অর্থে। তাঁর কালের অন্য কবিরা কেউই তা গ্রহণ করেননি।[২] সঞ্জয়ের প্রথম কবিতা গ্রন্থ সাগর ও অন্যান্য কবিতা-র 'একটি কবিতাও জীবনানন্দে নিমজ্জিত নয়' জানিয়ে আলোকরঞ্জন মন্তব্য করেছেন : 'তবু সৃষ্টির শুরু থেকেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য যেন জীবনানন্দকে একটি বিকল্প অস্মিতা (Alter-ego) হিসেবে খাড়া করিয়ে এক ধরনের একলব্যতায় এগিয়ে যেতে চেয়েছেন।'[৩] প্রসঙ্গত, সঞ্জয়ের 'সেই উদাসী মনময়তা' যে সুধীন্দ্রনাথকে 'আবিষ্ট করেছিল" এবং তার 'লিরিক লাবণ্যকে" সুধীন্দ্রনাথ যে তাই 'নন্দিত করেছেন' —তা উল্লেখ করে অলোকরঞ্জন লিখেছেন : 'নাকি সেদিন তিনি লিরিক বলতে গীতিকবিতাকেই বুঝিয়ে ছিলেন? কবির অগ্রজ অজয় ভট্টাচার্যর কথা তাঁর মগ্ন অবচেতনে ছিল না কি,...।'[৪] কিন্তু এপ্রিল ১৯৩২ থেকে যে সঞ্জয়ের 'পূর্বাশা' প্রকাশিত হচ্ছে (কুমিল্লার পরে ১৯৩৩ থেকে কলকাতায় চলে আসে দপ্তর) এবং যে সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' -এ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, আমি যত দূর জানি আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রকৃত গীতিকবিতা লেখেন কেবল আপনি'— যখন লিখছেন সুধীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালের ৮ জুলাইরে চিঠিতে[৫], তখন প্রত্যক্ষ তো কেবল সঞ্জয়ই হওয়ার কথা! তাছাড়া, সারস্বত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেছেন, 'তিনি বলেছিলেন, আপনার লিরিকগুলো নৈর্ব্যক্তিক হয়'। কথাটা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে, পরে আমি বুঝতে পেরেছি। আমার লিরিককে তিনি তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন, যদিও বিন্দুমাত্র মেলে না আমার কবিতা তাঁর কবিতার সঙ্গে। যাই হোক, তাঁর কথা থেকে আমি বুঝলাম, এগুলি লিরিক হচ্ছে এবং নৈর্ব্যক্তিক হচ্ছে।' শিলীন্ধ্র প্রকাশন থেকে মাঘ ১৪০০-এ প্রকাশিত সুমিতা চক্রবর্তীর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'উর্বর উর্বশী' : উৎসের অতিক্রমণ ও মৌলিক নির্মাণ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

তিন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দে নিবেদিতপ্রাণ এক কবি-সাহিত্যিক। আর অনেকেই যখন জীবনানন্দকে অনুধাবন করতে পারেননি গতানুগতিক কাব্য-আস্বাদনের বাইরে আসতে না পেরে, বা বুদ্ধদেব বসুর মতো যাঁরা একদা জীবনানন্দের কবিতার গুণগ্রাহী হিসাবে তাঁর সপক্ষে বলিষ্ঠ কলম ধরেও পরের দিককার কবিতা নিয়ে নিরুৎসাহ হয়ে প্রশ্ন তোলেন, অথবা যাঁরা সাহিত্য সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণে কুণ্ঠিত না হয়ে জীবনানন্দকে করে তোলেন ক্ষতবিক্ষত—তাঁদের থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন অন্যরকম। জীবনানন্দে তাঁর আগ্রহ-আবেগে কোনওদিন ভাঁটা পড়েনি। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সওয়াল করে গেছেন তিনি জীবনানন্দের পক্ষে। তাঁর কবিতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে বা তিনি কোনও আক্রমণের সম্মুখীন হলে, কেউ কেউ যখন চেয়েছেন যে স্বয়ং জীবনানন্দ কিছু বলুন সে বিষয়ে, হতাশ জীবনানন্দ কখনও চেয়েছেন যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কিছু লিখলে ভালো হয়!

ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিড়ম্বনার মধ্যে বার বার প্রার্থনা করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সহযোগিতা। জানতেন, কী অর্থের জন্য, কী অন্য যে কোনও সহযোগের জন্য—তাঁকে একবার লিখলে বা বললেই কিছু-না-কিছু একটা ব্যবস্থার জন্য যথাসাধ্য করবেই সঞ্জয়। ১৬-৬-১৯৫০ তারিখের চিঠিতে তার - পাঁচশ' টাকা চেয়ে লিখেছেন জীবনানন্দ : '...আমাদের মতো দু'চারজন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকের এ রকম দাবি গ্রাহ্য করার মতো বিচারবিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন।' আমরা বুঝতে পারি কতটা তাড়িত হয়ে দেশ-এর সুরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়েছিলেন সঞ্জয় এই কথা-কয়টি শোনাতে : 'সামান্য কিছু টাকার জন্য জীবনানন্দ কিছু লেখা নিয়ে আজ এসেছিলেন আপনাদের কাছে; আপনারা নেননি, ফেরত দিয়েছেন; তাতে জীবনানন্দ অপমানিত হননি, তিনি মান -অপমানের ঊর্ধ্বে, সময় একদিন তা বলবে; অপমানিত হয়েছি আমরা সবাই, যারা সাহিত্যসেবা করি বলে ভাবি।[৬] সাহায্য-সহযোগ সম্ভব হয়নি যখন, সত্যিকারের কষ্ট পেয়েছে সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ১৯৪৪ সালে পূর্বাশা লিমিটেড থেকে প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী" কবিতাগ্রন্থটি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করে জীবনানন্দ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের যে সামান্য - দু-একটি বই পাওয়া যায় এখনও, তার মধ্যে আজও সমান উজ্জ্বল 'কবি জীবনানন্দ' (ভারবি, ফাল্গুন ১৩৭৬,মার্চ ১৯৭০ —মরণোত্তর প্রকাশন)। জীবনানন্দ গবেষকদের একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। জীবনানন্দের কবিতা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলির এই সংকলন গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে— আজও তা অনেক সময়ই দিশারীর ভূমিকা পালন করে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের কবিতার বরাবর গঠনমূলক এবং রসগ্রাহী আলোচনা করে গেছেন। সে আলোচনায় নেতির কোনও স্থান ছিল না, কেন না তাঁর মনে হয়েছিল, '...তাঁর কবিতার কিছু স্থায়ী দান আছে। দানের স্থায়িত্ব মহৎ কবিতারই একটি লক্ষণ। সে মহত্বকে স্পষ্ট - পরিচ্ছন্ন করে দেখানোই সমালোচকদের কর্তব্য।' প্রসঙ্গত ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'তিনজন আধুনিক কবি" গ্রন্থেও জীবনানন্দকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তিনি (অন্য দু'জন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু)। যাই হোক, জীবনানন্দ - সমালোচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিল গ্রাম ও শহর সম্বন্ধে তাঁর নিবিড় পরিচয় (ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্তে ব্রাহ্মণ - বেড়িয়া মহকুমার নবীনগর থানার অন্তর্গত মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত শ্যামগ্রামে জন্মানো সঞ্জয় তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে কলকাতাকে করেন স্থায়ী কর্মস্থল। প্রসঙ্গত। জীবনানন্দের জেলা বরিশাল থেকে কলকাতা—প্রথমে মাঝে মাঝে, দেশ ভাগের পরে একেবারে), তাঁর বহুধাবিস্তৃত জ্ঞান ('ভালো লিখতে হলে অনেক পড়তে হয়, দেশে বিদেশে, আজকের কালকের অনেক অনেক দিন আগের, ইতিহাসের, দর্শনে—' —এই মতে বিশ্বাসী সঞ্জয় ভূমেন্দ্র গুহকে বলেছিলেন, 'আবোলতাবোল ভাবে, যখন যা হতে পাচ্ছি, পড়ছি, তেমনভাবে নয়, একটা

পদ্ধতি নির্ণয় করে নিয়ে পড়তে হয়। দেশের ইতিহাস পুরাণশাস্ত্র সাহিত্য দর্শন— যতটা সম্ভব ভালো করে পড়ে বিদেশের জ্ঞানগরিমার সঙ্গে পাশে রেখে মিলিয়ে রেখে—"[৭]) —সর্বোপরি তাঁর আপন কবিসত্তা। জীবনানন্দও প্রশংসা করেছিলেন সঞ্জয়ের কবিতার। পদাবলী-র কবিতা পড়ে ভালো লাগা জানিয়ে, তার নানা জায়গায় সঞ্জয়ের 'পাণ্ডিত্য, মনের বিস্তৃতি ও গভীরতা' যে 'স্পষ্ট হয়ে আছে' তা জানিয়েছিলেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত কবিকে যেদিন আর ধরে রাখা সম্ভব হল না তাঁদের পক্ষে— যেদিন চলে গেলেন জীবনানন্দ —গণেশ অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে, একা, ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে মনে হয়েছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্যের : 'মর্তের বন্দর থেকে একটি জাহাজ শান্তি পারাবারে চলে গেল।' লিখেছিলেন কবিতা : 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেলো। হলো নিরুদ্বেলও, মনের জেটির কাঠ নেই আর ওঠা-নামা মাল।... ভূমেন্দ্র সম্পাদিত 'ময়ূখ' পত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সঞ্জয়ের উত্তর পঞ্চাশ কবিতাগ্রন্থে 'জীবনানন্দের মৃত্যুররাত্রির কবিতা' শিরোনামে সেটি ছাপা হয়। তাঁর কবিতা জীবনানন্দ দাশ গ্রন্থটি শেষ হয় উক্ত কবিতা - প্রসঙ্গ ছুঁয়ে। লিখেছেন : 'মৃত্যু মুখ আমাকে কাঁদায়। জাগ্রতে, স্বপ্নে বা স্মৃতিতে— যেখানেই তাঁর উপস্থিতি দেখি, খুবই প্রাঞ্জলভাবে খানিকটা প্রাণ যেন জল হয়ে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।'' বোঝা যায়, কী বিপুল ধস নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সত্তায়!

চার

সরোজ দত্ত তাঁর 'সঞ্জয় ভট্টাচার্য' পুস্তিকাতে (বাগর্থ; জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী -৪, সাধারণ সম্পাদক : অলোক রায়; ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) জানিয়েছেন : '১৩৪১ (১৯৩৪)-র শেষদিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য পরিচিত হন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌমেন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন এই সময়।' যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় দু'টি কবিতার বই বেরিয়ে গেলেও (সাগর ও অন্যান্য কবিতা এবং পৃথিবী) তা পাঠিয়ে কবির মতামত সম্ভবত চাননি সঞ্জয় ভট্টাচার্য— তখনকার দিনে যা হামেশাই চাওয়া হত। তবে গদ্য-কবিতার সপক্ষে কবিকে কলম ধরতে অনুরোধ করেছেন, পূর্বাশার সম্পাদকীয় লিখে প্রকাশের আগে চিঠির সঙ্গে তা পাঠিয়ে লিখেছেন : 'লেখাটি চলে কিনা দয়া করে যদি জানান আর তার সঙ্গে আপনার মতটিও, তবে সাহস করতে পারি।' কবির মূল্যবান সময় অনেক কথা শুনে নষ্ট হয় জানেন, 'বোঝার উপর শাকের আঁটি দিতে হচ্ছে বলে' তিনি 'অত্যন্ত লজ্জিত" -ও বোধ করেন; তবু, কবিকে লিখছেন, 'কিন্তু কি করব—আপনাকে না বলে আর কার কাছে বলবই বা?' কবিকে জানাচ্ছেন, 'বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি ততদূর হয়েছে" যাতে করে একটা 'সাহিত্য প্রতিষ্ঠান" গড়ে তোলা যায়। ৮ মে ১৯৪০ কবির জন্মদিনে কবিতার শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন (তোমার যৌবন, কবি, দেখিয়াছে যুবতী আকাশ/ জ্যোৎস্না-উত্তরীয় ঢাকা ফাল্গুনের বাসর শয্যায়...), শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কবিতায়, কবির আশি বছরের জন্মদিনে 'পঁচিশে বৈশাখ' শিরোনামে এক কবিতায় ('পৃথিবী এখনো তেমনি ত আছে জানি / তেমনি সূর্য যারে সে প্রণাম করে/ বিরহ লিখন তেমনি আকাশ' পরে/ শুধু কি হারালো রূপ তার প্রিয় বাণী?...', শেষ অনুচ্ছেদটি এইরকম : 'তবু তো পৃথিবী উষার আকাশে দানি, / পাঠায় প্রণাম কোন এক সূর্যেরে,/ যার সাথে সেই হারানো দিনরা ফেরে—/ তোমার ভাষায় লেখা আছে যার বাণী।') কবির মৃত্যুর পরে রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্বাশাতে 'কবিতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয় শেষোক্তটি। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর প্রেমে দেহ গুরুত্ব পায়নি বলে সমালোচনা করতে ছাড়েননি, 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'শেষ প্রশ্ন' ইত্যাদি 'বইগুলির ভেতর উদ্দেশ্যটা এমনই নগ্ন হয়ে উঠেছে যে, তাদের ভেতর উপন্যাস আর বেঁচে নেই"[৮] বলেছেন নির্দ্বিধায়, 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধেও খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেননি ('বইখানাকে আমি উপন্যাস বলব না, বলব, স্বাদেশিকতার সরস সমালোচনা।' ইত্যাদি[৯]), কিন্তু উত্তরপঞ্চাশ কবিতাগ্রন্থের 'রবীন্দ্র জন্মদিনে' কবিতায় লিখছেন : 'তাপস বৈশাখ এলে শুভ্রতম রবীন্দ্রনাথ আমি তোমায়/ স্মরণ করি।/ এ কবিতার শেষটুকুও একটু উদ্ধৃত করি : 'ভোলা যায় না তোমার সত্তার দীপ্তি-তৃপ্তি/ পেত না মন যার মহার্ঘ সান্নিধ্যে বারবার/ এসেও। এ যেন দেখার এক দুরন্ত কামনা। / এ যেন তেমন কামনা— লাখ লাখ যুগ দেখেও/ যার সৌম্যমূর্তি আরো লাখ লাখ যুগ কাছে/ টেনে নেয়। আমি তোমাতে অতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ।' প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ তিরোধানের পর চৌত্রিশ বছর বয়সে 'গোরা'র ভূমিকাতে অভিনয়ের মাধ্যমেই 'শৌখিন নটবৃত্তির শেষ" সঞ্জয়ের। উত্তর পঞ্চাশ কবিতাগ্রন্থে উক্ত রবীন্দ্র জন্মদিনে কবিতার ঠিক পরের কবিতাটি 'বাইশে শ্রাবণ' (তোমার মৃত্যুর দিনে মনে পড়ে অনেক মৃত্যুরে...)।

সঞ্জয়ের পাঠানো কয়েকটি কবিতা পড়ে 'ভালো লাগল' বলে জানিয়ে লিখেছেন কবি : 'এতে গদ্য-কাব্যের রূপ ও রস ভালোরকম প্রকাশ পেয়েছে।' নিজের সম্পাদনায় ১৯৩৮ সালে যে 'বাংলা কাব্য পরিচয়' প্রকাশিত তার জন্য দু-একটি কবিতা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'যার বিষয় নয় নরনারীর প্রেম এবং যার বাহন নয় গদ্য'। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সায়াহ্ন' কবিতাটি স্থান পেয়েছিল সেই সংকলনে। তার পূর্বে ১৯৩৫ -এর অক্টোবরে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় এবং সমর সেনের সহসম্পাদনায় বেরনো যে পত্রিকাটি সঞ্জয় ও সত্যপ্রসন্ন তাঁদের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পূর্বাশা প্রেস থেকে—যেখান থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বেশিরভাগ বই-ই প্রকাশিত—বিনামূল্যে ছাপার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। সে পত্রিকায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে সত্যপ্রসন্নর নামই মুদ্রিত এবং পূর্বাশার ঠিকানাই পত্রিকার কার্যালয় হিসাবে ঘোষিত) সঞ্জয়ের পূবোক্ত যে 'নীলিমাকে" কবিতাটি ছাপা হয়েছিল, তার প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের কাছে।

পাঁচ

একাধিক আলোচক সঞ্জয় সম্বন্ধে শিরোনাম করেছেন 'মগ্নচেতনার চিত্রকার" বলে ('মেঘলা আকাশের অন্ধকার তুমি মগ্নচেতনার চিত্রকর/ অতীত কত দূরে মনের গুহাবাসে! অচেনা মনে হয় সব প্রহর!' —প্রথম দু'টি পঙ্‌ক্তি আছে— এই রকম, তাঁর 'উর্বর উর্বশী" কাব্যগ্রন্থের 'স্বভাব ধ্রুপদ" কবিতায়)। আলোকরঞ্জন সঞ্জয়ের 'কবিকৃতি'কে বলেছেন, 'মূলত মননভিত্তিক, আবেগ যার চালচিত্র।'[১০] সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি লেখায় সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন, 'আধুনিকতামুখী, কিন্তু বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি বলেই তাঁর পরিচিতি এবং সে পরিচয় অ-সত্যও নয়। কিন্তু আমরা অনেকেই লক্ষ করি না যে প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন ইতিহাস-সচেতন ও কাল-সচেতন এক শিল্পী।' লিখছেন, 'বস্তুতই সময়কে বহু মাত্রায় মুদ্রিত করতে চেয়েছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য অতীত থেকে বর্তমানে। কিন্তু কখনওই তা অনাদিকালের দার্শনিক উপলব্ধিতে বিলীন হয়ে যায়নি।'[১১]

স্বয়ং কবির কী উপলব্ধি নিজের কবিতা সম্বন্ধে? ১৯৫৮ সালে এক স্থানে লিখছেন সঞ্জয়: 'কবিতার ক্ষেত্রে আমি নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারিনি। নিজের পাঠকের ভূমিকা নিলেও আমি আমার কবিতা থেকে একটা সুস্পষ্ট কবি-আলেখ্য পাব না, কেননা কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা বা চেতনা এখানে বিকাশের পথ পায়নি। আমার খন্ডিত সত্তার পরিচয়ে আমার কবিতাগুলো আমার নিকট পরিচিত। সে সত্তা সব ক্ষেত্রে কবি-সত্তা কি না সে-সম্পর্কেও আমার সন্দেহ দুস্তর। আমি যদি আমার কবিতা পাঠকের উপযোগী করে বাছাই করতে যাই তাহলে হয়ত বিশ পঁচিশটির বেশি আমার মনোনীত হবে না।'[১২] সেই ১৯৫৮ সালে দাঁড়িয়ে—যখন কিনা অনেক প্রশংসা পাওয়া হয়ে গেছে তাঁর—আত্মমূল্যায়নমূলক অকপট এমন স্বীকারোক্তি অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য যে তাঁর কবি - ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারেননি তার পিছনে সম্পাদক হিসাবে তাঁর আজীবনের পত্রিকাপ্রেম কম দায়ী নয়! তাছাড়া, পত্রিকা প্রয়োজন ছাড়াও প্রচুর গদ্য লেখার দায় তো ছিলই— কখনও আপনি তাগিদে, কখনও পয়সার!

তা হোক, সম্পাদক হিসাবে পত্রিকাপ্রেম থেকে প্রাপ্তিও তো কম নয়! সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে একজন শক্তিমান কবি বলে উল্লেখ করে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরা যখন বলেন, 'সাগরদা বা সঞ্জয় ভট্টাচার্য এদের থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে উপকার পেয়েছি তাও ভোলবার নয়'[১৩] —তখন সে প্রাপ্তির গরিমাকে অবজ্ঞা করে সাধ্য কার! কিংবা, প্রতিষ্ঠিত লেখকের প্রকাশ পেতে যাওয়া লেখা অন্য সংস্থার জন্য সরিয়ে রেখে, সদ্যপঠিত দূর জেলার অপরিচিত এক লেখকের গল্প প্রকাশের ব্যবস্থা করা— পরে ধারাবাহিক যাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড' প্রকাশিত হয়—সেই অমিয়ভূষণের মুগ্ধতা! রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অরবিন্দ, শরৎচন্দ্র, দিলীপকুমার রায়, মোহিতলাল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শৈলজানন্দ, জগদীশ গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র, অজিত দত্ত, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, হুমায়ুন কবির, দীনেশরঞ্জন দাশ, নীহাররঞ্জন রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখের পাশাপাশি রমাপদ চৌধুরী, নরেশ গুহ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধায়, ভূমেন্দ্র গুহ, অরবিন্দ গুহ, আলোক সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—এমনই তো কতগুলো উল্লেখযোগ্য নাম পূর্বাশার লেখক-তালিকার। প্রথম ধাত্রীও তো তিনি অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি" বা প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মস্মতি'র। 'এক তরুণ পাঠকের জন্ম' শীর্ষক এক লেখায়[১৪] শঙ্খ ঘোষ জানাচ্ছেন তাঁদের যৌবনকালে পূর্বাশার তুল্য আকর্ষণ আর কিছুরই ছিল না। তাঁর মনে হয়েছে যে পূর্বাশার মধ্যে ছিল 'একটা মতবাদ বা রাজনীতিক পট থাকলেও, তাঁর মনে হয়েছে, 'সম্পাদকের এ-দৃষ্টান্তও ছিল যে সৃষ্টিশীলতার উপর কোনো অতিপ্রান্তিকতার ভর সয় না।' বলেছেন : 'তাই 'কবিতা' পত্রিকার অতিবিশুদ্ধতার প্রান্ত ছেড়ে দিয়ে, 'পরিচয়' পত্রিকার অতিসামাজিকের প্রান্ত ছেড়ে দিয়ে, 'পূর্বাশা' হয়তো আমাদের সামনে তৈরি করে তুলতে চাইছিল কোনো মধ্যবর্তী পথ, কোনো সমন্বয়ের পথ, সেইকথা ভেবেই পাঠক সেদিন একটা সহজ শ্বাস নিতে পারত সে-পত্রিকা থেকে।'

ছয়

কি সাহিত্যিক হিসাবে, কি সম্পাদক হিসাবে—কী চেয়েছেন আর কত দূর পৌঁছেছেন—অন্যকথায়, নিজের ব্যর্থতার কথা প্রকাশেও, কুণ্ঠা দেখি না আমরা তাঁর। তাঁর পত্রিকার কোনোও নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি, তাঁর সাহিত্যের তিনি পাঠক পাননি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একেবারে দু-একজন অনুগামী ছাড়া, তাঁর কোনো শিষ্যগোষ্ঠীও গড়ে ওঠেনি স্বাভাবিক ভাবেই। এ-সব নিজেই স্বীকার করে গেছেন 'দুর্বোধ্যতা'কে 'কবিতার শত্রু নয়, সহচর' মনে-করা এই কবি ও নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যকর্মী।

ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতাও কি মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে তোলেনি তাঁর স্মৃতি সত্তা— ঘটায়নি কি রক্তক্ষরণ! তার একটুও কি আভাষ মেলে না উত্তরপঞ্চাশ কবিতাগ্রন্থের 'জন্মদিনের কবিতা'র এইসব পঙ্‌ক্তিতে : 'তাই ভবিষ্যৎময় আজ এক অতীত কৌতুকে/ তোমারে শোনাই, নারী, গান/ তোমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি পাওয়া ভিষকের ভীষণ- সম্মান।' নারীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি পাওয়া যে -কোনও কবিরই (অবশ্যই পুরুষ) কাঙ্ক্ষিত নিশ্চয়ই, কিন্তু কবিতার নামটি আমরা ভুলি কী করে!

তবু এ-কথাও ঠিক যে নিঃসঙ্গ, অবসাদগ্রস্ত (মূলত অর্থনৈতিক কারণে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন হাতের শিরা কেটে এবং একই সঙ্গে অনেকগুলি ঘুমের বড়ি খেয়ে। সময়টা ১৯৫১ সালের ১২ জুলাইয়ের ঘটনা। দীর্ঘ চার মাসের চিকিৎসায় জীবন ফিরে পেলেও পূর্ণ সুস্থ আর হয়নি কোনওদিন—সর্বগ্রাসী বিষণ্ণতাও সঙ্গী থেকে যায় বাকি জীবন ধরে), স্নেহবুভুক্ষু (ভূমেন্দ্র গুহর পূর্বোক্ত পুস্তকে বড় বিষাদকর ভাবে তা ফুটে উঠেছে) এই মানুষটি (সঙ্গে বন্ধুটিও) সাহিত্যেরই বলি! কিন্তু, শেষ বিচারে, খুব বেশি কি চেয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য! তারকাখচিত বাঙলা সহিত্যাকাশে তিনি কি চাননি একটুকু

ঠাঁই— চাওয়ামাত্রই যাঁর উপস্থিতি প্রবলভাবে চোখে নাই পড়ুক, তিনি যে দৃষ্টির অগোচর নন—একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে তিনি আছেন— এই আশ্বাসটুকু! মুগ্ধতা ঝরে পড়ুক আর নাই পড়ুক, মনোযোগী দৃকপাতেই তিনি ধন্য:

‘রাত্রি এসে আমারে শুধায়:
‘কী দিয়েছ পৃথিবীরে?’
কী দিয়েছি! দিইনি কিছুই।
বরং নিয়েছি তুমি যা রেখেছ পাশে—
সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, ভুঁইচাঁপা, জুঁই।’

(জন্মদিনে, অপ্রেম ও প্রেম)

উল্লেখসূত্র:

১। স্বনির্বাচিত, সম্পাদনা—শান্তনু বসু ও রুদ্রেন্দু সরকার, অনির্বাণ প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৭০।
২। জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল—সুমিতা চক্রবর্তী, সাহিত্যলোক, ফাল্গুন ১৯৯৩, (মার্চ ১৯৮৭)
৩। দেশ, ২-২-২০০৯।
৪। প্রাগুক্ত।
৫। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১৬।
৬। জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং —ভূমেন্দ্র গুহ, সৃষ্টি প্রকাশন, বইমেলা ২০০১।
৭। প্রাগুক্ত।
৮। সাহিত্য-বিচার, পূর্বাশা সংকলন ১, সত্যপ্রিয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আশ্বিন ১৪০৮ (অক্টোবর ২০০১)
৯। পূর্বোক্ত পুস্তকে ‘পুস্তক - পরিচয়’ বিভাগে ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসের সমালোচনা।
১০। পূর্বোক্ত দেশ
১১। কালের প্রহরী, আমমার সম পত্রিকা, মে ২০০৯।
১২। ভূমিকা, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্ব নির্বাচিত কবিতা, ৭ কার্তি ১৮৮০ শকাব্দ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:।
১৩। আমার সময় পত্রিকা, মার্চ ২০১০-এ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাক্ষাৎকার।
১৪। শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ, ৪র্থ খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং নববর্ষ ১৪০৯ (এপ্রিল ২০০২)।

এগুলি ছাড়া, কিছু কিছু তথ্যের জন্য প্রভাতকুমার দাসের ‘মগ্নচেতনার চিত্রকর: সঞ্জয় ভট্টাচার্য’ লেখাটির কাছে (আজকাল, শারদ সংখ্যা, ১৪১৬) ঋণ স্বীকার করি। আর ঋণ স্বীকার করি বিশ্বভারতী প্রকাশিত চিঠিপত্র-র ষোড়শ খণ্ডটির কাছে (৭ পৌষ ১৪০২, সম্পাদক—সুতপা ভট্টাচার্য)।